অপেক্ষা

আহমেদ সাবের

-১-

আমার ছোট ভাই রিপনের পালানোর স্বভাবটা নতুন নয়। এর আগেও সে পালিয়েছিল দু বার। প্রথম বার, সেই আট বছর বয়সে। ওর তখন একটা পোষা বেড়াল ছিল; আর ওটা ছিল মহা চোর। যত খাবারই দেয়া হোকনা কেন, চুরি সে করবেই। একবার চুরি করে পাতিল থেকে দুধ খেয়েছিল বলে, মা বেড়ালটাকে মেরেছিলেন। মায়ের উপর রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল রিপন। যাবে আর কোথায়? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। পালিয়ে ছোট খালার বাড়ী চলে গিয়েছিল পাশের গ্রামে, তিন কিলোমিটার পথ ডিঙ্গিয়ে। খবর পেয়ে পরদিন বাবা ওকে নিয়ে আসেন।

পরের বছর আবার পালিয়েছিল সে। আমরা দু ভাই একই স্কুলে পড়তাম। ওর তৃতীয়, আর আমার পঞ্চম শ্রেণী। গ্রামের প্রাইমারী স্কুল; বেশীর ভাগ ক্লাস, পরীক্ষা - একসাথেই হতো। ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় পরীক্ষার খাতার চেয়ে নিসর্গের প্রতি ওর অধিকতর মনোযোগ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, এবারও কিছু একটা ঘটবে। আমার সন্দেহের কারণে হোক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, যেদিন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো, সে দিন বিকেল থেকেই রিপন লা-পাত্তা। এক দিন যায়, দু দিন যায়, কোন খবর নাই। মা প্রথম দিন প্রকাশ্যে বেশ কিছু কাঠিন্য দেখালেও, পরদিন সেটা আর ধরে রাখতে পারলেন না। ভোর থেকেই কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। মায়ের কান্না, কিংবা সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই হোক, বাবা ক্ষেতের কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়লেন রিপনকে খোঁজার জন্য। আমার উপরও দায়িত্ব পড়লো, কাছাকাছি যায়গা গুলো সন্ধান করার। বেশ রাত করেই ফিরলেন বাবা। মুখ দেখেই বুঝলাম, কোন সুসংবাদ নাই।

পরদিন সকালে বাবা বসে বসে ভাবছিলেন, এর পর কি করনীয়। বড় চাচাও পাশে বসে। মা আমাদের পড়ার ঘরের এক কোনে বসে গুন গুন করে কাঁদছিলেন।

চিন্তা কইরা কি করবি সালাম। বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন বড় চাচা। পোলাপান মানুষ; কই আর যাইবো? হয় মামা, না হয় খালার বাড়ী। দুই একদিনের মধ্যেই খবর পাইয়া যাইবি।

সব মামা খালার বাড়ী খবর নিছি। কোনহানেও যায় নাই। বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দেন।

চেয়ারম্যান সাবের বাড়ীত গেলে কেমন হয়? তাইনে একখান পথ বাতলাইয়া দিতে পারবো। বড় চাচার প্রস্তাব।

ভাবছি যামু। বাবা সম্মতি দেন।

ল, এখনি যাই। দেরী হইলে তাইনে গঞ্জে চইলা যাইবো। বলে বাবাকে তাড়া দেন বড় চাচা।

বাবা ঘরে ঢুকে গামছাটা মাথায় পেঁচিয়ে বেরুতেই দেখা গেল, আমাদের গ্রাম সুবাদে আসমত চাচার হাত ধরে, উঠানের মাঝখানে মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিপন। বাবার মুখ রাগে কঠিন হয়ে উঠলো। উনি কিছু একটা অঘটন ঘটাবার আগেই, মা এসে জড়িয়ে ধরলেন রিপনকে। আর রিপন সবার সামনে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। রিপনের কান্নাটা বাড়ীতে ফেরার আনন্দের, না বাবার মারের ভয়ের, সেটা বুঝে উঠতে পারলাম না।

আসমত চাচা তারাগঞ্জের পাটকলে কাজ করেন। ওনার বয়ানে জানা গেলো, গতকাল সন্ধ্যের সময় পাটকলের দু নম্বর গেইটের বাইরে, রিপনকে দেখতে পান তিনি। সে আমাদের গ্রামের ষ্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে পড়েছিল নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পরের তারাগঞ্জ ষ্টেশনে রেল পুলিশ দেখে ভয়ে নেমে পড়েছিল। সাথে টাকা পয়সা কিছুই ছিলনা বলে দু দিন ধরে ছিল অভুক্ত।

এবার পালালো সে তিন বছর পর। সময়ের হিসেবে তিন বছর অতিক্রম করলেও, ক্লাসের হিসেবে সে প্রায় বৃক্ষের মতই স্থাণু। প্রাইমারী স্কুলের গণ্ডি পেরুতে পারেনি এখনো। এদিকে আমি সপ্তম শ্রেণীতে উঠে গেছি। বাবা বুঝে ফেলেছেন, ওকে দিয়ে আর লেখা পড়া হবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দেবেন। রিপন ভাল মন্দ কিছু বললো না। একদিন দেখা গেল, সে আবার লা-পাত্তা। আমরা সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য বারের মত এবারও তার খবর পাওয়া যাবে। দেখা যাবে, একদিন কাক ডাকা ভোরে কাচু মাচু মুখ করে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। না সে আর ফিরে এলো না। এর মধ্যে স্থানীয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে। গ্রামের বাজারে মাইকিং করা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। মাঝে মাঝে উটকো খবর আসে, রিপনকে অমুক যায়গায় দেখা গেছে। তমুক ষ্টেশনে দেখা গেছে। মা আমাদের গ্রামের পীরের দরগায় যাওয়া শুরু করলেন। দরগার খাদেম বলেছেন, রিপন আরব দেশে আছে। ভাল আছে। মায়ের কান্না ধীরে ধীরে কমে এলো। আমি ভেবেছিলাম, মা বোধ হয় রিপনের শোকটা সামলে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু আমার ধারনা ভুল প্রমাণিত হলো শেষ পর্যন্ত।

আমার সপ্তম শ্রেণীর ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল দিয়েছে। গত দু বছর দ্বিতীয় স্থানে থেকে এবারে প্রথম বারের মত ক্লাসে প্রথম হয়েছি। বাড়ীতে আসতেই আনন্দের হাট বসে গেল। বাবা চাচা, চাচী সবাই খুশীতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার মায়ের কথা খেয়াল হলো। আরে, মা কই। কিন্তু মাকে আশে পাশে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমি রান্না ঘরে গেলাম। না, মা সেখানে নাই। উঠানের কোথাও মাকে দেখা গেলো না। আমার এত বড় একটা আনন্দ সংবাদ। আর মা আমাকে একটু আদর করলেন না। আমার একটু অভিমানই হলো।

আমাদের বসত ঘরের এক পাশটা বেড়া দিয়ে আমার আর রিপনের পড়ার যায়গা করা হয়েছে। আমি সেখানে যেতেই দেখি, মা মাটিতে বসে রিপনের স্কুলের ব্যাগটা বুকে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছেন।

-২-

আরো নয় মাস কেটে গেছে। রিপনের নামটা যেন আমাদের পরিবার থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে দিনের শেষের রৌদ্রের মতো। আমি আমার ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষার পড়া শুনা নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়লাম। বেশীর ভাগ সময়ই স্কুলে কাটাই। ক্লাসের শেষে কোচিং হয়। বাবা ব্যস্ত ওনার জমি জমা নিয়ে। মা একা একা নীরবে বাড়ী ঘর সামলান। একদিন বিকেল বেলা বাড়ীতে অঙ্কের বই নিয়ে বসে, একটা অঙ্ক নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। এমন সময়, রজব চাচা বাড়ী আছেন? বলে কেউ একজন আমাদের ঘরের সামনে এসে থামলেন। রজব নামটা আমার বাবার। মা ইসারায় আমাকে বেরিয়ে, দেখার জন্য বললেন। আমি অনিচ্ছা সত্বেও বেরিয়ে এসে দেখি, এক ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

বাবা ত বাড়ীত নাই। আমতা আমতা করে বললাম আমি।

তোমার মা আছে? তাইনে থাকলেই চলবো। আমি রিপনের ব্যাপারে একটা খবর লইয়া আসছি। রিপন তোমার ছোড ভাই না? প্রশ্নটা আমাকে।

আমি উত্তর দেবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন মা।

আস্লামাইকুম চাচী, আমার নাম হারুন গাজী। মাকে উদ্দেশ্য করে বললো লোকটা। তারাগঞ্জের আসগর মাতবর আমার চাচা লাগে।

বও বাবা, বও। বলে একটা পিড়ি এগিয়ে দিলেন লোকটাকে। রিপনের কথা কি কইতাছিলা?

হ চাচী, হের কথা কইবার লাইগাই ত কাম কাইজ ফালাইয়া এতদুর আইলাম। বসতে বসতে বললেন হারুন গাজী। আমি কাম করি আবুধাবীতে। ছুটিতে আইলাম দেশে। আইসা শুনলাম রিপনের কথা। শুইনাই আমি বেকুব বইনা গেলাম। কয় কি? আমি ত হেরে আবুধাবীতে দেইখা আইছি।

কই দেখছো বাবা? মার চোখ মুখ খুশীতে আতস বাতির মত জ্বলে উঠলো।

আবুধাবীতে। উত্তর দিলেন হারুন গাজী। তখন ত আমি হেরে আর চিনতাম না।

তা হইলে হে যে রিপন, বুঝলা কি কইরা? মায়ের প্রশ্ন।

কইতাছি চাচী। আমি কাম করি আবুধাবীর কাছে আল-রাহাবা নামের এক শহরের হাসপাতালে; সিকিরুটির কাম। আমাগো হাসপাতাল আবুধাবী থেইকা দুবাই যাওনের রাস্তায় পড়ে। সেই খানে উটের দৌড় হয় বছরে একবার। এক্কেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শেখেরা জিতনের লাইগা মেলা টাকা পয়সা ঢালে। গরুর গাড়ী যে চালায়, তারে কয় গাড়োয়ান; আর উটেরে যে চালায়, তারে কয় উটের জকি। এক উটের জকিরে দেইখা আমার কেমুন সন্দ হইলো, পোলাডা বোধ হয় আমাগো দেশের।

আপনে হেরে জিগাইলেন, হের বাড়ী কই? আমি মাঝখানে প্রশ্ন করি।

না হইলে আর চিনলাম কি কইরা? জিগাইলাম, বাড়ী কই? ছেমরা ত জবাব দিতে চায় না। ডর করে, মালিক যদি আবার মাইর লাগায়। আমিও পিছ ছাড়ি না। এক সময় মালিক আড়াল হইতেই পোলাডা নিজেই আমার কাছে আইলো। কইলো, অর নাম মোসাদ্দেক আলী, ডাক নাম রিপন; বাড়ী মাসুম পুর, বাপের নাম রজব আলী। তখন ত আর পাত্তা দিই নাই। বাড়ীতে আইসা সবার মুখে রিপনের কথা শুইনা আমার টনক নড়লো।

হারুন গাজীর কথা শুনে মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

কাইন্দেন না চাচী। আমি ত আগামী মাসে আবার যাইতাছি। ওরে খুইজা আপনের হাতে অবশ্যই তুইলা দিমু।

ওরে কেমনে খুজবা বাবা? কাঁদতে কাঁদতে বললেন মা। হে ত উট লইয়া কই চইলা গেছে।

পামু চাচী, পামু। যে খানেই উটের দৌড় হয়, সেখানেই যামু। রিপনরে খুইজা বার করন আমার দায়িত্ব। আমাগো কাছের গেরামের একটা পোলা হারাইয়া যাইবো আর আমি বইসা বইসা দেখুম, তেমুন মানুষ আমি না।

তুমি বও বাবা, আমি একটু চা দেই তোমারে।

না, না চাচী। আমার আইজকা সময় নাই। দুই সাপ্তাহ পর আবার আসুম চাচী। তখন চা খামু। বলে চলে গেলেন হারুন গাজী।

সাপ্তাহ দুয়েক পরে হারুন গাজী এলেন সকালের দিকে। বাবা তখনও ক্ষেতে যান নি। বাবাকে মা আগেই হারুন গাজী সম্পর্কে বলেছেন। তাই আসতেই বাবা সমাদর করে বসালেন ওনাকে। আগামী সাপ্তাহে আমার বৃত্তি পরীক্ষা। তাই এক নজর উঁকি দিয়ে আমি আমার পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

ক্ষেতে কামলারা আসবে বলে বাবা কিছুক্ষন পর চলে গেলেন। হারুন গাজী অনেকক্ষন বসলেন। মা ওনাকে পিঠা আর চা দিলেন এবং আমাকেও ডাকলেন পিঠা খাবার জন্য।

চাচী কইলো, তুমি না কি বৃত্তি দিবা এবার। মাশাল্লাহ। আমাকে বললেন উনি।

হ, বলে মাথা নাড়লাম আমি।

খুব ভালা, খুব ভালা। তিন চাইর মাসের মধ্যে তোমার ছোড ভাই আইসা পড়বো। ওর ত পড়াশুনার ক্ষতি হইলো অনেক। বাড়ী আসলে ওরে একটু দেখাইয়া দিবা। বড় ভাইর দায়িত্ব হইলো ছোড ভাইরে দেখা। যাও, তুমি পড়া শুনা কর। আগামী সাপ্তায় ত তোমার বৃত্তি পরীক্ষা।

আমি ওনাকে সালাম দিয়ে উঠে চলে এলাম।

সেই যে হারুন গাজী গেলেন, প্রায় তিন বছর হতে চললো। আমি স্কুল শেষ করে কলেজে পা দিয়েছি। আমরা সবাই জানি, তারাগঞ্জের আসগর মাতবরের হারুন গাজী বলে কোন ভাতিজা নেই। কিন্তু মা এখনো বিশ্বাস করেন, হারুন গাজী আসগর মাতবরের ভাতিজা - কাছের না হোক, দুর সম্পর্কের। উনি একদিন রিপনকে নিয়ে ফিরে আসবেন। দরগার খাদেমের কথা কি মিথ্যে হতে পারে? আমি মাছ ধরতে গিয়ে যদি বড় কোন মাছ পাই, মা দুঃখ করেন। আহারে, আমাগো যদি একখান ফিরিজ থাকতো, মাছডা রিপনের লাইগা রাইখা দিতে পারতাম। কোরবানীর মাংস শুকিয়ে রেখে দেন ওর জন্য। শীতের দিনে খেজুরের রসের ফিরনি রান্না করলে দুঃখ করেন, রিপনডা কত চাইত, রসের সিন্নি খাইতে। মা ওর তের-চৌদ্দ বছর বয়সের প্যান্ট-শার্ট গুলো গুছিয়ে রেখেছেন বড় যত্ন করে। কিছু দিন পর পর ধুয়ে রোদে শুকিয়ে আলমারীতে উঠিয়ে রাখেন।

মাঝে মাঝে বাবার অগোচরে মা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে শিপন, আরব দেশ থেইকা মাসুম পুর আওনের পেলেনের ভাড়া কত? আমি আন্দাজ করে একটা কিছু উত্তর দেই। মা নির্লিপ্ত মুখে শুনে যান।

মায়ের বিয়ের সময় আমার নানার দেয়া একটা স্বর্নের হার মা আমাদের দু ভাইকে মাঝে মাঝে দেখাতেন। অনেকদিন সেটা দেখিনা। একদিন মায়ের অজান্তে মায়ের গহনার বাক্সটা খুলে দেখলাম, হারটা সেখানে নেই। কই গেল জিনিষটা? মা কি সেটা অন্য কোথাও রেখেছেন? না কি রিপন পালাবার সময় ওটা নিয়ে গেছে? না মা হারুন গাজীকে দিয়েছেন হারটা রিপনের প্লেনের ভাড়া হিসেবে? মা কে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবো করবো করেও করা হয় না।

Sydney 16 May, 2011